যুদ্ধাপরাধ কি?

মালয়া, লোগাং, লংগদু, নান্যাচরসহ অসংখ্য গণহত্যা কি আন্তর্জাতিক আইনে যুদ্ধাপরাধ নয়?

তারিক কাফালা
বিবিসি নিউজ অনলাইন

হেগে যুগোশ্লাভিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট স্লোবোদান মিলোসেভিক ও যুদ্ধাপরাধের দায়ে অভিযুক্ত অন্যান্যদের যে বিচার চলছে তাকে আন্তর্জাতিক আইন ও আন্তর্জাতিক বিচার প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য একটি কঠিন পরীক্ষা হিসেবে দেখা হচ্ছে।

কিন্তু যুদ্ধাপরাধ বলতে আসলে কি বোঝায়? এর সাথে কোন আইনের সম্পর্ক রয়েছে এবং কে এই ধরনের অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার করতে পারে?

যুদ্ধাপরাধ হলো একটি সাম্প্রতিক ধারণা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে সাধারণভাবে মেনে নেয়া হতো যে যুদ্ধের প্রকৃতির মধ্যেই রয়েছে যুদ্ধের বিশৃঙ্খলতা। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় লক্ষ লক্ষ মানুষ খুন - বিশেষত নাৎসী জার্মানী কর্তৃক ইহুদী নিধন - এবং জাপানীদের হাতে বেসামরিক ব্যক্তি ও যুদ্ধ বন্দীদের নিগৃহীত হওয়ার ঘটনা মিত্র শক্তিকে এই সব অপরাধের জন্য দায়ি ব্যক্তিদের বিচার ও শাস্তি প্রদানে বাধ্য করেছে। ১৯৪৫ ও ১৯৪৬ সালে নুরেমবার্গ বিচারে ১২ জন নাৎসি নেতার ফাঁসি হয়। একই ধরনের একটি প্রক্রিয়া ১৯৪৮ সালে টোকিওতে শুরু হয়। সাত জাপানী কমান্ডারকে ফাঁসি দেয়া হয়, তবে মিত্র শক্তি সম্রাট হিরোহিতোকে বিচারের কাঠগড়ায় নিয়ে না আসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

হেগে ট্রাইবুনালে যে সমস্ত মামলার শুনানী চলছে সে সব মামলার সামনে কেবলমাত্র উক্ত বিচারগুলোই হলো নজীর।

তাছাড়া, যে সব ক্ষেত্রে কোন রাষ্ট্র মনে করেছে যে ন্যায় বিচার করা হয়নি সে সব ক্ষেত্রে সে সব রাষ্ট্রগুলো আলাদাভাবে নিজেদের উদ্যোগে বিচার করেছে।

এটা চমৎকারভাবে ঘটেছে ১৯৬০ সালে যখন ইসরায়েলী এজেন্টরা কনসেনট্রেশন ক্যাম্প গঠন ও ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের সাথে সরাসরি যুক্ত একজন উচ্চপদস্থ নাৎসী নেতাকে আর্জেন্টিনায় খুঁজে বের করে। তাকে অপহরণ করে ইসরাইলে নিয়ে আসা হয়। সেখানে তার বিচার ও পরে ফাঁসি দেয়া হয়।

এ সম্পর্কিত সর্বসাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত হলো ১৯৮৭ সালের ক্লজ বারবি'র বিচার। ইনি হলেন ফ্রান্সে জার্মান দখলের সময়কার একজন নেতৃস্থানীয় নাৎসী নেতা। তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়।

আইনসম্ভার

যুদ্ধাপরাধ ধারণার মূলে যে ভাবধারাটি রয়েছে তা হলো কোন একটি দেশের বা রাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনীর কার্যকলাপের জন্য ব্যক্তি বিশেষকে দায়ি করা যাবে। গণহত্যা, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ, যুদ্ধের সময় বেসামরিক ব্যক্তি কিংবা যোদ্ধার সাথে অন্যায্য আচরণ - এ সবই যুদ্ধাপরাধের পর্যায়ে পড়তে পারে। গণহত্যা হলো এই সব অপরাধসমূহের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক অপরাধ।

যে আইনসমূহ যুদ্ধাপরাধকে সংজ্ঞায়িত করে সেগুলো হলো জেনেভা কনভেনশনসমূহ। এগুলো হলো প্রাচীন ও বিস্তৃত আইনগুচ্ছ যাদেরকে যুদ্ধের আইন কানুন বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। এছাড়া রয়েছে হেগে আন্তর্জাতিক ক্রিমিনাল ট্রাইবুনালের সংবিধি, যা সাবেক যুগোশ্লাভিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

চতুর্থ জেনেভা কনভেনশনের ১৪৭ ধারায় যুদ্ধাপরাধকে নিম্নলিখিতভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে:

"Wilful killing, torture or inhuman treatment, including ... wilfully causing great suffering or serious injury to body or health, unlawful deportation or transfer or unlawful confinement of a protected person, compelling a protected person to serve in the forces of a hostile power, or wilfully depriving a protected person of the rights of fair and regular trial, ... taking of hostages and extensive destruction and appropriation of property, not justified by military necessity and carried out unlawfully and wantonly"

অর্থাৎ সুরক্ষিত কোন ব্যক্তিকে বেআইনীভাবে দেশত্যাগে বাধ্য করা অথবা স্থানান্তরিত করা অথবা বেআইনীভাবে আটকিয়ে রাখা এবং ইচ্ছাকৃতভাবে যন্ত্রণা দেয়া অথবা শরীরে কিংবা স্বাস্থ্যে মারাত্মকভাবে জখম করাসহ ইচ্ছাকৃত হত্যা, নির্যাতন অথবা অমানবিক ব্যবহার, কোন সুরক্ষিত ব্যক্তিকে শত্রু বাহিনীতে কাজ করতে বাধ্য করা অথবা তাকে ন্যায় বিচার থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে বঞ্চিত করা, ... পণবন্দী করা এবং সামরিক প্রয়োজনের দ্বারা যুক্তিযুক্ত নয় এমন ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ও সম্পত্তির আত্মসাৎ যা বেআইনীভাবে ও বেপরোয়াভাবে করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক আইনজ্ঞদের মতে এটাই হলো যুদ্ধাপরাধের মৌলিক সংজ্ঞা। হেগ ট্রাইবুনালের সংবিধি বলে যে, ১৯৯২ সাল থেকে সাবেক যুগোশ্লাভিয়ায় যে সব সন্দেহভাজন ব্যক্তি যুদ্ধের আইন ও রীতি লঙ্ঘন করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে তাদের বিচার করার অধিকার আদালতের রয়েছে। ৩ নং ধারায় এ ধরনের লঙ্ঘনের উদাহরণ দেয়া হয়েছে:

বেপরোয়াভাবে নগর, শহর ও গ্রাম ধ্বংসকরণ অথবা সামরিক প্রয়োজনীয়তার দ্বারা যুক্তিযুক্ত নয় এমন ধ্বংসযজ্ঞ;

অরক্ষিত দালান অথবা আবাসগৃহ, গ্রাম ও শহরের ওপর আক্রমণ অথবা বোমা বর্ষণ - তা যে উপায়ে করা হোক না কেন;

ধর্ম, দাতব্য, শিক্ষার এবং শিল্পকলা ও বিজ্ঞানের জন্য উৎসর্গীত প্রতিষ্ঠান, ঐতিহাসিক স্মৃতিস্তম্ভ এবং শিল্পকর্ম ও বিজ্ঞানকর্ম কুক্ষিগত করা, ধ্বংস করা অথবা সেগুলোর ইচ্ছাকৃত ক্ষতিসাধন;

সরকারী ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির লুটপাট।

ট্রাইবুনাল মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধকে সশস্ত্র সংঘাতের সময় সংঘটিত কিন্তু বেসামরিক জনগোষ্ঠির বিরুদ্ধে পরিচালিত অপরাধ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছে। ৫ নং ধারায় উদাহরণের একটি তালিকা দেয়া হয়েছে। যেমন: খুন, ধ্বংস, দাসবন্দী করণ, দেশান্তর, বন্দীকরণ, নির্যাতন, ধর্ষণ এবং রাজনৈতিক, জাতিগত ও ধর্মীয় কারণে নিবর্তন।

ট্রাইবুনাল গণহত্যাকে সংজ্ঞায়িত করেছে একটি জাতিগত, জাতিসত্তাগত, বর্ণগত কিংবা ধর্মীয় গোষ্ঠিকে সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক ধ্বংস করার অভিপ্রায়ে সংঘটন করা কার্য হিসেবে।

তবে যুদ্ধাপরাধ সংক্রান্ত আইন ক্রমাগত বিকশিত হচ্ছে। ২০০১ সালের ফেব্রুয়ারিতে হেগের ট্রাইবুনাল এক রায়ে যুদ্ধের সময় সংঘটিত ব্যাপক ও গণ ধর্ষণ এবং যৌন দাসত্বকরণকে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করেছে।

এভাবে গণ ধর্ষণ বা যুদ্ধের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত ধর্ষণকে যুদ্ধের নিয়মনীতি লঙ্ঘন থেকে একটি অন্যতম জঘন্য যুদ্ধাপরাধে উন্নীত করা হয়েছে, যার স্থান কেবল গণহত্যার পরেই।

যুদ্ধাপরাধ চিহ্নিতকরণ

যুদ্ধাপরাধ হয়েছে কিনা তা চিহ্নিত করা সব সময় সহজ হয় না। শত্রু বাহিনী কর্তৃক বেসামরিক লোকজনকে তাদের বাড়িঘর থেকে অন্যত্র সরিয়ে নেয়াকে যুদ্ধাপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয় না। এক্ষেত্রে এই যুক্তি দেয়া যেতে পারে যে বেসামরিক লোকদেরকে সরানো হচ্ছে তাদের রক্ষা করার জন্য। একে যুদ্ধাপরাধ বলে গণ্য করা হয় তখনই, যখন এই ধরনের বিতাড়নকে জাতি নিধন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে অথবা বেসামরিক লোকদের জন্য গণ শাস্তি প্রদানের অভিসন্ধি হিসেবে প্রমাণ করা যায়।

একইভাবে বলতে গেলে, কোন একটি দেশের বিমান বাহিনী কর্তৃক প্রচার প্রপাগান্ডা চালানোর কারণে কোন শত্রুর টেলিভিশন কেন্দ্রে বোমা নিক্ষেপ করা কি যুদ্ধাপরাধ হবে? জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী এটা যুদ্ধাপরাধ নয়। কারণ যেভাবে কোন রাষ্ট্রের পরিকাঠামো যেমন রাস্তাঘাট, সেতু, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, কারখানা ইত্যাদি সামরিক কাজে ব্যবহৃত হলে তা শত্রুবাহিনীর বৈধ লক্ষ্যবস্তু হয়ে থাকে, টেলিভিশন স্টেশনও তাই। এই ধরনের হামলা তখনই যুদ্ধাপরাধ হয়, যদি এই হামলার কারণে বেসামরিক লোকজনের ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা একই হামলা থেকে প্রাপ্ত সামরিক লাভের তুলনায় অতিরিক্তি হয়।

আন্তর্জাতিক আদালত

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলো দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধাপরাধ ও মানবতার বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধ মোকাবিলার জন্য একটি একক বৈশ্বিক আইন ব্যবস্থার দাবি জানিয়ে আসছে। ১৯৯৩ সালের মে মাসে সাবেক যুগোশ্লাভিয়ার জন্য স্থাপিত আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালত ছাড়াও, ১৯৯৪ সালে রুয়াণ্ডায় সংঘটিত বিভিন্ন অপরাধের বিচারের জন্য অন্য একটি আন্তর্জাতিক আদালত তানজানিয়ার আরুশায় গঠিত হয়েছে। হেগ ও আরুশার আদালত দুটি যুদ্ধাপরাধের দায়ে অভিযুক্তদেরকে বিচারের আওতায় নিয়ে আসার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলেও, নুরেমবার্গ ও টোকিওর মতো এই আদালতগুলোও কেবল সুনির্দিষ্ট যুদ্ধক্ষেত্রে সংঘটিত যুদ্ধাপরাধ বিচারের জন্য নিবেদিত।

২০০৩ সালের জুন পর্যন্ত ১৩৯টি দেশ আন্তর্জাতিক ফৌজদারী আদালত গঠন সম্পর্কিত রোম চুক্তি স্বাক্ষর করেছে ও ৯০টি দেশ তার অনুমোদন দিয়েছে (অর্থাৎ স্ব স্ব দেশে আইন পাস করে - অনুবাদক)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই চুক্তি স্বাক্ষরে অস্বীকৃতি জানিয়েছে এই যুক্তিতে যে, এই আদালতকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে আনীত মামলার পিছু নিতে ব্যবহার করা যাবে।

এই ধরনের আন্তর্জাতিক আদালত রাজনৈতিক কিনা - যেমনটা মিলোসেভিক ও অন্যান্যরা বলছেন - সে প্রশ্ন সকল আন্তর্জাতিক আইনী প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর ঝুলছে। একভাবে বলতে গেলে এটা সত্য যে আদালতগুলো রাজনৈতিক, কারণ আদালতগুলোর কাজ শুরুর আগে সেগুলোর প্রতিষ্ঠা ও আর্থিক যোগানদানের জন্য আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ইচ্ছার দরকার পড়ে।

আন্তর্জাতিক আদালতের সমালোচকরা প্রায়শ বলে থাকেন যে, আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার কেবলমাত্র তখনই সত্যিকার অর্থে বৈধ হতে পারে, যখন সকল যুদ্ধাপরাধকে - তা যে দেশেই সংঘটিত হোক না কেন - একটি মাত্র আন্তর্জাতিক আদালতের এক্তিয়ারে নিয়ে আসা হয়।

-অনুবাদ স্বাধিকার

বলিভিয়ায় আদিবাসীদের নেতৃত্বে পরিচালিত গণআন্দোলনের আংশিক বিজয়

স্বাধিকার আন্তর্জাতিক ডেস্ক

রাজধানী লা পাজে জনগণের বিক্ষোভ

কয়েক সপ্তাহ ধরে চলতে থাকা গণ অভ্যুত্থানের মুখে গত ৯ জুন বলিভিয়ার প্রেসিডেন্ট কার্লোস মেসা পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন বলিভিয়ার সুপ্রীম কোর্টের সভাপতি এডুয়ার্দো রড্রিগেজ। দেশের আদিবাসী জনগণ, শ্রমিক ও কৃষকদের জন্য এ এক বিরাট বিজয়।

বিক্ষোভকারীদের দুইটি প্রধান দাবি ছিল প্রাকৃতিক গ্যাসকে জাতীয়করণ করা ও সাংবিধানিক পরিষদের নির্বাচন দেয়া।

দক্ষিণ আমেরিকার মহান স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা সিমন বলিভারের নামে রাখা বলিভিয়া দেশটি দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে সবচেয়ে হত দরিদ্র। প্রাকৃতিক গ্যাস সম্পদে ভেনেজুয়েলার পরই তার স্থান হলেও, ৯০ লক্ষ জনসংখ্যার দেশ বলিভিয়ায় ৩০ শতাংশ চরম দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করতে বাধ্য হন। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে বিদেশী কোম্পানীদের হাতে যেমন রেপসল, ব্রিটিশ পেট্রোলিয়াম, টোটাল, এনরন, পেট্রোব্রাস ইত্যাদি। এই কোম্পানিগুলো গ্যাস সম্পদ আহরণ করে প্রচুর মুনাফা অর্জন করলেও সাধারণ জনগণের জন্য কোন লাভ হয়নি। সেজন্য এবারের বিক্ষোভের অন্যতম লক্ষ্যবস্তু ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও এইসব বহুজাতিক কোম্পানিগুলো।

দেশের জনসংখ্যার ৬২ ভাগই হলেন আদিবাসী - যেমন আয়মারা, কুয়েচুয়া ও গুয়ারানি জাতিগোষ্ঠি। দেশে এরাই হলেন সবচেয়ে দারিদ্র্যের শিকার এবং সেজন্য গণবিক্ষোভে তাদের অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বই ছিল প্রধান।

আসলে বলিভিয়ার জনগণ বহুদিন আগে থেকে ফুঁসে উঠছিলেন। গত ২০০৩ সালের অক্টোবরে প্রবল গণজোয়ারের মুখে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট গনজালো সানচেজ দি লোজাদার সরকার উৎখাত হয়। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় পালিয়ে যান। তার সরকার গ্যাস সম্পদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করার পরিকল্পনা করলে জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। কারণ যেভাবে গ্যাস রপ্তানি করা হতো তাতে কেবল বহুজাতিক গ্যাস কোম্পানি ও সাম্রাজ্যবাদী সুপারপাওয়ারটিরই লাভ হতো। জনগণের কোন উপকার হতো না।

লোজাদার উৎখাতের পর ভাইস প্রেসিডেন্ট কার্লোস মেসা তার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি তেল ও গ্যাস শিল্পের ব্যাপারে গণভোট অনুষ্ঠান ও নতুন সংবিধান প্রণয়নের অঙ্গীকার করেন। কিন্তু তাকেও প্রবল গণঅভ্যুত্থানের মুখে পদত্যাগ করতে হলো।

২০০৫ সালের ২ মার্চ রাজধানী লা পাজের পার্শ্ববর্তী এলাকা এল আলটোর জনগণ এক সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেন। পানীয় জলের বেসরকারীকরণের সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতে ছিল এই ধর্মঘট। এল আলতোর ৯০ ভাগ জনসাধারণ হলেন আদিবাসী। তাদের বিক্ষোভের ফলে সরকার ফরাসী কোম্পানী Suez Lyonnaise des Eauxi- এর সাথে চুক্তি বাতিল করতে বাধ্য হয়। এই চুক্তি কার্যকর হলে দুই লক্ষ লোক পানীয় জলের অধিকার থেকে বঞ্চিত হতেন।

২০০০ সালে অন্য একটি বিক্ষোভ আন্দোলনও সাফল্য লাভ করে। মার্কিন কোম্পানি Bechtel দেশ থেকে চলে যেতে বাধ্য হয়।

ল্যাটিন আমেরিকার অন্য প্রায় সবকটি দেশের মতো বলিভিয়াও সাম্রাজ্যবাদ ও তার দেশীয় দালালদের দ্বারা বর্বর শোষণের শিকার। স্পেনের কোম্পানি রেপসল (Repsol/YPF) এর নির্বাহী প্রধান এ বছরের গোড়ার দিকে স্বীকার করেছেন যে, "বলিভিয়ায় তেল ও গ্যাস শিল্প খুবই লাভজনক - কারণ এক ডলার বিনিয়োগ করলেই ১০ ডলার উঠিয়ে আনা যায়।" তেল ও গ্যাস কোম্পানিগুলো বছরে ১.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করে। অথচ তার বিপরীতে বলিভিয়ার সরকার ট্যাক্স হিসেবে পায় মাত্র ৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। তাছাড়া, উত্তোলন খরচ কম হওয়া সত্ত্বেও বলিভিয়ায় জ্বালানীর দাম আন্তর্জাতিক দামের চাইতে বেশী। দেশটির প্রচুর গ্যাস সম্পদ থাকা সত্ত্বেও বলিভিয়া ল্যাতিন আমেরিকার দ্বিতীয় দরিদ্রতম দেশ (হাইতি হলো সবচেয়ে দরিদ্র)।

২০০০ সাল থেকেই গণআন্দোলনের মুখে ইকুয়েডর, আর্জেন্টিনা ও বলিভিয়ায় বেশ কয়েকজন নব্য উদারনীতিবাদী সরকার প্রধানকে বিদায় নিতে হয়েছে। বলিভিয়ার বর্তমান আন্দোলনও ছিল প্রেসিডেন্ট মেসার নব্য উদারীকরণ নীতির বিরুদ্ধে। বিক্ষোভকারীরা "মেসা বাড়ি ফিরে যাও, জনগণের হাতে ক্ষমতা দাও" শ্লোগান দেয়। তাদের হাতে ছিল লাঠি ও চাবুক। এল আলটো থেকে প্রথম এই বিক্ষোভ শুরু হয়েছিল। তিন সপ্তাহ ধরে বিক্ষোভ চলার পর তা সাধারণ ধর্মঘটের আকারে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এতে কংগ্রেস, বিমান বন্দর, সেবা প্রতিষ্ঠান, যোগাযোগ মাধ্যম, বাজার অচল হয়ে যায়। সারা দেশ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। ধর্মঘটের ফলে রাজধানী লা পাজ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে, গ্যাস ও তেল সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়।

সুপ্রীম কোর্টের প্রেসিডেন্ট এডুয়ার্দো রড্রিগেজ প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেয়ার পরও সব ব্যারিকেড তুলে নেয়া হয়নি। আল আলটোর সংগ্রামী জনগণ প্রাকৃতিক সম্পদ জাতীয়করণ দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। নতুন প্রেসিডেন্ট আল আলটোর নেতৃবৃন্দের সাথে কয়েক ঘন্টা ব্যাপী কথা বলেন। নেতৃবৃন্দ তাকে কিছু সময় দিয়েছেন। বলিভিয়া জনগণের বিদ্রোহ শেষ হয়ে যায়নি। বর্তমান সময়টা শক্তি সঞ্চয়ের জন্য সাময়িক যুদ্ধবিরতি মাত্র। ■